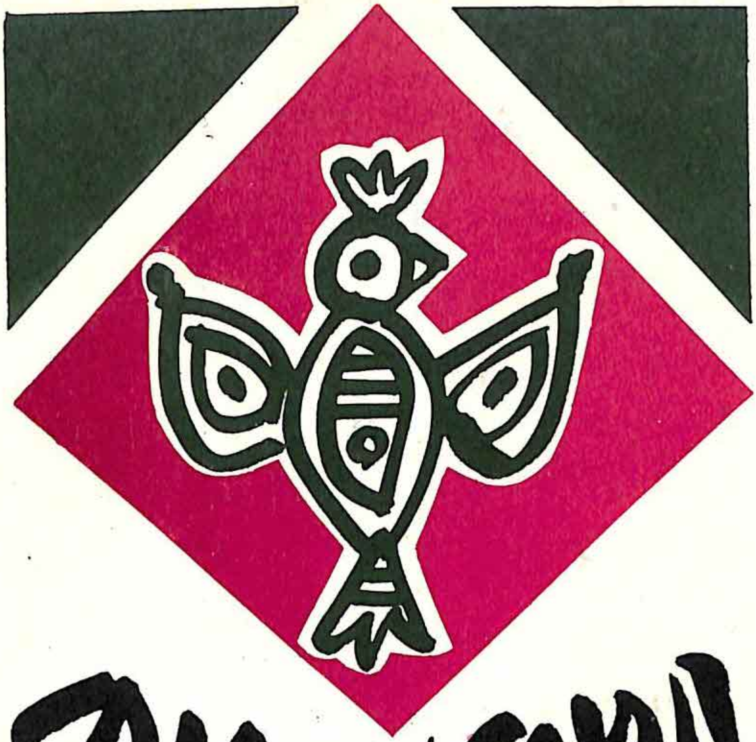


কাঞ্চনরেখা



প্রাচীন গীতিকার গল্প

প্রাচীন গীতিকার গল্প

কাজলরেখা

গল্প প্রবীর সেন

ছবি কৃষ্ণেন্দু চাকী

ওরিয়েন্ট লংম্যান

ISBN O 86311 140 8

ওরিয়েন্ট লংম্যান

রেজিস্টার্ড অফিস
৩-৬-২৭২ হিমায়াৎনগর, হায়দ্রাবাদ ৫০০০২৯

অন্যান্য অফিস
কামানী মার্গ, বালার্ড এস্টেট, বোম্বাই ৪০০০৩৮
১৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলকাতা ৭০০০৭২
১৬০ আন্না সালাই, মাদ্রাজ ৬০০০০২
১/২৪ আসফ আলী রোড, নিউদিল্লী ১১০০০২
৮০/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, বাঙ্গালোর ৫৬০০০১
৩-৬-২৭২ হিমায়াৎনগর, হায়দ্রাবাদ ৫০০০২৯
বিড়লা মন্দির রোড, পাটনা ৮০০০০৪
এস সি গোস্বামী রোড, পানবাজার, গুয়াহাটি ৭৮১০০১
পাতিয়ালা হাউস, ১৬ এ অশোক মার্গ, লক্ষ্মৌ ২২৬০০১

প্রথম প্রকাশ, ১৯৯০

প্রকাশক
ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড
১৭, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ
কলকাতা ৭০০ ০৭২

ফটোটাইপসেটিং
ইউনিক অ্যাকিউরেটস্ প্রাঃ লিঃ
৫৮/৪ এ, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড
কলিকাতা ৭০০ ০৪৫

মুদ্রক
প্রতিক্ষণ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৭০০ ০১৫



অনেক কাল আগের কথা। ভাটি মুলুকে থাকত ধনেশ্বর নামে এক সওদাগর। সে ছিল মস্ত ধনী। তার হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া আর কুঠুরি ভরা মোহর তো ছিলই, আর ছিল তার সব রত্নের সেরা রত্ন, দুটি মা-হারা সন্তান।

ছেলের নাম রত্নেশ্বর। মেয়ের নাম কাজলরেখা। সাঁঝের বাতির মতো ঘর আলো করে রাখত দুই ভাই-বোন। কাজলরেখার রূপ দেখে লোকে বলত—

হিরে মোতি জ্বলে কন্যা যখন নাকি হাসে।
নতুন বর্ষায় যেন পদ্মফুল ভাসে।।

বেশ সুখেশান্তিতে সওদাগরের দিন কাটছিল। হঠাৎ তার মাথায় এল দুর্বুদ্ধি। জুয়াখেলার নেশায় ধরল তাকে। আর এই জুয়া খেলতে গিয়ে সে হল সর্বস্বান্ত।

একে একে তার সব গেল। হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, ভাণ্ডারে সোনাদানা, মণিমাণিক্য যা ছিল—সব হারাল।

দুঃখের আর শেষ নেই। যার ভাণ্ডারে ছিল রাশি রাশি সোনাদানা, সে আজ পথের ফকির। ভিক্ষে করে কোনমতে দিন কাটে।

সকলি হারাল তিনি পাপিষ্ঠ জুয়ায়।
ফকির হইয়া তিনি ঘুরিয়া বেড়ায়।।
কন্যা পুত্র মাত্র তার হইল সম্বল।
বারো ডিঙ্গা ধন তার গেল রসাতল।।

একদিন সওদাগর এক জটাজূটধারী সন্ন্যাসীর দেখা পেল। তার গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে চিমটে আর কমণ্ডলু। সন্ন্যাসী সওদাগরকে বললেন, 'ওহে, তোমাকে দেখে মনে হয় না তো তুমি ভিখারী হয়ে জন্মেছ, তবে এমন দশা হল কী করে?'

সওদাগর তখন একে একে তার দুঃখের কথা সব বলল। শুনে বড় দয়া হল সন্ন্যাসীর। একটা মানিকের আংটি আর একটা শুকপাখি দিয়ে বললেন, 'শোন সওদাগর, এই শুকপাখির নাম ধর্মমতি। এর কথামত যদি চল, তাহলে তোমার সুখের দিন আবার ফিরে আসবে।'

এই শুনে সওদাগরের মনে ফুটে উঠল আশার আলো। খুব ভক্তিভরে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করল সওদাগর। তারপর সন্ন্যাসীর দুটি দান মাথায় নিয়ে ফিরে এল তার ভাঙা প্রাসাদে।

সওদাগর শুকপাখিকে বলল, 'পাখি, তুমি আমার দুর্দশা চেয়ে দ্যাখো। আমার রত্নমন্দির, জলটুঙি, প্রাসাদ সব ভেঙে পড়েছে। মাটিতে শুয়ে রাত কাটাই। আঁজলা পেতে জল খাই। ফকির হয়ে পথে পথে ঘুরি। আমার এই দুঃখের দিন কবে শেষ হবে বলতে পারো?'

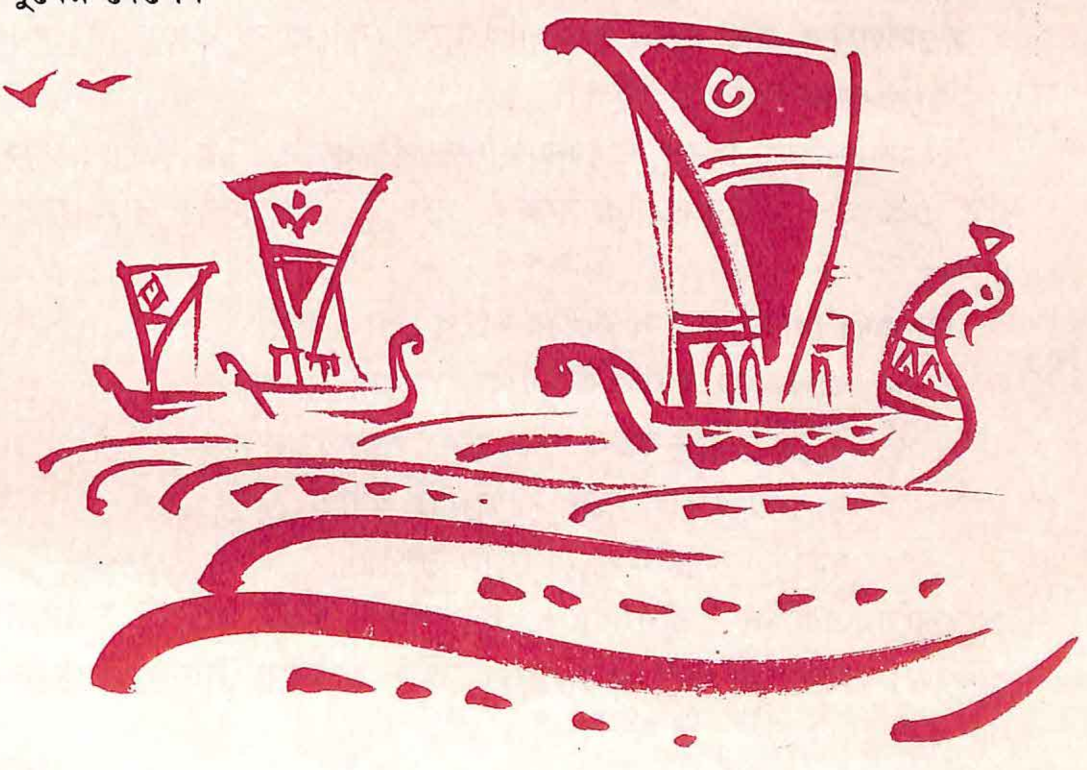
সব শুনে শুকপাখি ঘাড় গুঁজে চোখ দুটো শিবচক্ষু করে কী যেন ভাবতে শুরু করল।

এইভাবে অনেকটা সময় কেটে যাবার পর বলল, 'সন্ন্যাসী যে আংটিটা তোমাকে দিয়েছেন সেটা মহামূল্য এক মানিকের আংটি।

রাজার কাছে আংটিটা নিয়ে গেলে, রাজা তার উপযুক্ত দাম দিয়ে কিনে নেবে। সেই টাকা নিয়ে তোমার ভাঙা নৌকোগুলো আবার জোড়া লাগাও। নানা পসরা দিয়ে নৌকো সাজাও। তারপর শুভদিন দেখে বাণিজ্য করতে বেরিয়ে পড়।'

পুব দেশেতে যাওরে বণিক নদী পাড়ি দিয়া।
এক বছরের ধন খাবে বারো বছর বসিয়া।।

শুকপাখির কথামত সওদাগর আংটি নিয়ে রাজার কাছে গেল। রাজা সেই আংটি পেয়ে খুশি হয়ে সওদাগরকে দিল অনেক টাকা। এত টাকা সওদাগর একসঙ্গে অনেক দিন দেখে নি। এবার সে মনে বেশ জোর পেয়েছে। লোকলশকর লাগিয়ে নৌকোগুলো সব জোড়া লাগাল। নানা জিনিস সওদা করে থরে থরে নৌকো সাজাল। তারপর শুভ দিনক্ষণ দেখে, মাঝি মাল্লা সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল বাণিজ্য করতে—পুবের দেশে।



দেখতে দেখতে কেটে গেল এক বছর। ধর্মমতি শুকপাখির কথা সত্যি হল। সওদাগর একে একে ফিরে পেল তার হারানো ধন। প্রাসাদে আর ধরে না। আবার হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, লোকজন, দাসদাসীতে আগের মতো জমজমাট হয়ে উঠল প্রাসাদ।

সওদাগর এখন শুকপাখিকে সব সময় চোখে চোখে রাখে। পাখির গুণের কথা যাতে পাঁচকান না হয়, তার জন্য লোকচক্ষের আড়ালে শুকপাখির জন্য একটা ঘর করে দিয়েছে সওদাগর। আদর-যত্নের কোনো ত্রুটি নেই। সে এখন সোনার দাঁড়ে বসে সোনার বাটিতে ছোলা খায়।

একদিন সওদাগর বলল, 'শুক, তোমার পরামর্শে আমি হারানো ঐশ্বর্য ফিরে পেয়েছি ঠিক কথা, কিন্তু আমার মেয়ে কাজলরেখার যতদিন না যোগ্য পাত্রে বিয়ে হচ্ছে ততদিন আমি সুখী হতে পারব না। এ ব্যাপারে আমাকে কিছু পরামর্শ দাও।'

সওদাগরের কথা শুনে শুকপাখি মুখে কোনো রা কাড়ে না। শুধু ঘাড় গুঁজে শূন্যে তাকিয়ে রইল।

অনেক অনুনয়-বিনয়, অনেক সাধার পর বলল, 'এই মেয়ের বিয়ে হবে এক মৃত রাজকুমারের সঙ্গে। একে তুমি দক্ষিণের বনে রেখে এসো।'

এই কথা শোনা মাত্র সওদাগর দুঃখে ভেঙে পড়ল।

বাপ মায়ে পালে কন্যা বিয়া দেবার আশে।
আমি কেমন কইরা এমন কন্যা পাঠাই বনবাসে।।
দুঃখের কপাল মোর দুঃখ নাহি যায়।
ধর্মমতি কহে কথা না দেখি উপায়।।

শেষে একদিন ভোর রাতে, কাকপক্ষী ওঠার আগে, সওদাগর বাণিজ্যে যাবার ছল করে কাজলরেখাকে সঙ্গে নিয়ে নৌকোতে উঠল।

ঘুমচোখে কাজলরেখা কিছুই বুঝতে পারল না। নোঙর ওঠাতেই স্রোতের টানে নৌকো বয়ে চলল তরতর করে।

তিন দিন তিন রাত্তির পার হয়ে নৌকো এসে থামল এক গভীর অরণ্যে। চারধারে বড় বড় শাল, তমাল, শিমুলের সঙ্গে আরো কত কী গাছ। সেই বন দেখে, দিনের বেলাই গা ছমছম করে।

নৌকো থেকে নেমে সওদাগর মেয়েকে নিয়ে বনের পথ ধরল। কাজলরেখা বলল, 'বাবা,কোথায় নিয়ে চললে আমাকে?'

প্রথমে ছাড়িলা বাড়ি বাণিজ্য কারণে।
ডিঙ্গা রেখে নদীকূলে, কেন এলে বনে॥

সওদাগর কোনো কথা বলল না। শুধু চোখের জল মুছল কাপড়ের খুঁটে।

দুজনে আবার এগিয়ে চলল। অনেকটা হাঁটার পর সামনে পড়ল একটা পোড়ো মন্দির। চারধার গাছগাছালিতে ঢাকা। মন্দিরের মধ্যে



কোনো সাড়া শব্দ নেই —নিস্তব্ধ, নিঝুম। কাজলরেখা বলল, 'বাবা আমি আর হাঁটতে পারছি না। তেষ্টায় আমার বুক শুকিয়ে যাচ্ছে।'

সওদাগর তখন মন্দিরের কাছে কাজলরেখাকে রেখে জলের সন্ধানে গেল।

একা একা বসে আছে কাজলরেখা। হঠাৎ মনে হল তার মন্দিরটা একবার ঘুরে দেখলে হয়। কী আছে এই বন্ধ মন্দিরের ভেতরে? কাজলরেখা চারপাশ ঘুরতে ঘুরতে মন্দিরের বন্ধ দরজায় যেই একটু ঠেলা দিল, অমনি সেই দরজা আস্তে করে খুলে গেল। ভারি অবাক হল কাজলরেখা। এবার সে কিছুটা সাহসে ভর করে ভেতরে ঢুকল। ভেতরের অজানা রহস্য যেন কাজলরেখাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে, যেন বলছে— 'এসো কাজলরেখা, আরো ভেতরে চলে এসো।'

কয়েক পা এগিয়ে যেতেই কাজলরেখার কৌতূহল আরো বেড়ে গেল। এমন সময় সেই বিশাল দরজা আস্তে আস্তে আবার বন্ধ হয়ে গেল, কাজলরেখা তার কিছুই টের পেল না।

এদিকে সওদাগর জল নিয়ে ফিরে এসে দ্যাখে, কাজলরেখা নেই। আশপাশ অনেক খুঁজল; কোথাও হদিস পেল না, শেষে মন্দিরের ভেতর থেকে সাড়া পেল কাজলরেখার। সন্ধ্যে হতে খুব একটা দেরি নেই। পড়ন্ত রোদ মন্দিরের চাতালে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে। সওদাগর অনেক চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুতেই মন্দিরের বন্ধ দরজা খুলতে পারল না। তখন সে চিৎকার করে বলল, 'মন্দিরের ভেতরে কী আছে তুমি বল।' কাজলরেখা ভেতর থেকে



বলল, 'পালঙ্কে শুয়ে আছে এক রাজার কুমার। মাথার কাছে জ্বলছে ঘিয়ের প্রদীপ। রাজকুমারের চোখে পলক পড়ে না। মুখে কথা সরে না। তার সারা অঙ্গ সুচ বেঁধা।'

এই কথা শোনামাত্র সওদাগর চমকে উঠল। ধর্মমতি শুকপাখির কথাই তবে সত্যি। সওদাগর বলল, 'ধর্ম সাক্ষী করে মৃত কুমারের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়ে গেলাম। আজ থেকে এ তোমার স্বামী।'

চোখের জল মুছে সওদাগর বিদায় নিল। কাজলরেখা কান্নায় লুটিয়ে পড়ল বন্ধ মন্দিরের মেঝেতে। সুয্যিদেব পাটে বসল, নেমে এল ঘুটঘুটে রাত্তির। যখন জ্ঞান ফিরল কাজলরেখা দেখল, সুচ বেঁধা রাজকুমার পালঙ্কে একই ভাবে শুয়ে আছে। কোনো সাড়া শব্দ নেই। কাজলরেখা বলল,

জাগ জাগ সুন্দর কুমার কত নিদ্রা যাও।
আমি অভাগিনী ডাকি আঁখি মেলে চাও॥

সকাল হল। খুলে গেল মন্দিরের বন্ধ দরজা। এক তেজস্বী সন্ন্যাসী এসে কাজলরেখাকে মধুর সুরে বললেন, 'কেঁদো না মা, চোখের জল মুছে ফেল। তোমার কোনো ভয় নেই। এই কুমার এক রাজার ছেলে। তোমার সেবাতেই এ আবার প্রাণ ফিরে পাবে। তুমি এর দেহের সুচ একটা একটা করে খুলে ফেল। সব শেষে স্নান সেরে শুদ্ধ হয়ে চোখের সুচ দুটো খুলে, এই পাতার রস দু'চোখে লাগিয়ে দিও। তাহলেই এই রাজকুমার আবার বেঁচে উঠবে।'





কাজলরেখা সন্ন্যাসীর কথায় মনে কিছুটা সাহস পেল। কিন্তু এই রাজকুমারের কেনই বা এমন দশা হল, কী বা তার পরিচয়, কোথায় বা তার দেশ, এসব কথা কাজলরেখা জিজ্ঞেস করতে গিয়েও পারল না।

সন্ন্যাসী বললেন, 'আরো একটা কথা তোমাকে বলার আছে, যতদিন না ধর্মমতি শুকপাখি তোমার পরিচয় দেবে ততদিন তুমি — যত দুঃখই আসুক — কিছুতেই নিজে থেকে কাউকে নিজের পরিচয় দিতে যেও না। জোর করে কিছু করতে গেলে অমঙ্গল হবে।' এই বলে তিনি যাবার আগে রাজকুমারের মাথার কাছে রেখে গেলেন সেই আশ্চর্য পাতা।

সন্ন্যাসীর কথামতো কাজলরেখা মৃত স্বামীর শরীর থেকে একটা একটা করে সুচ বেছে তুলল। বাকি শুধু দু চোখের দুটি সুচ।

কাজলরেখা ঘাটে গেল স্নান করতে। এমন সময় দেখে, বনের পথ ধরে একটা বুড়ি চলেছে। সঙ্গে এক মেয়ে। মেয়েটির গায়ের রঙ কুচকুচে কালো, মাথায় কটা রঙের চুল—চুড়ো করে বাঁধা।

এই নির্জন বনে তাদের দু'জনকে দেখে অবাক হল কাজলরেখা। বলল, 'কোথায় যাচ্ছ তোমরা ?'

বুড়ি বলল, 'পেটের দায়ে মেয়েকে নিয়ে শহরে যাচ্ছি বিক্রি করতে।'

এই শুনে কাজলরেখার বড় মায়া হল। এই মেয়েটি আমার মতোই দুঃখিনী। একে যদি পাই তাহলে এ হবে আমার সবসময়ের সঙ্গী। এই ভেবে কাজলরেখা নিজের হাতের কঙ্কণ দিয়ে মেয়েটিকে কিনল। সোনার কঙ্কণ পেয়ে খুশি হয়ে বুড়ি যে পথে এসেছিল সেই পথেই আবার ফিরে গেল।

কাজলরেখা মেয়েটির নাম দিল তাই কঙ্কণদাসী।

কপাল দোষে কাজলরেখা হল বনবাসী।
কঙ্কণ দিয়ে কিনল ধাই নাম কঙ্কণদাসী ।।



কঙ্কণদাসীকে বলল কাজলরেখা, 'এই পথ ধরে মন্দিরে যাও। সেখানে এক মৃত রাজকুমার আছেন, তাকে দেখে যেন ভয় পেয়ো না। আমি স্নান সেরে এসে তার চোখের সুচ দুটো খুলে দেব, তারপর সন্ন্যাসীর দেওয়া পাতার রস বেটে চোখের কোলে লাগিয়ে দিলেই উনি বেঁচে উঠবেন। তুমি গিয়ে বসো, আমি এখুনি আসছি।'

কঙ্কণদাসী মন্দিরে এসে দ্যাখে, সত্যি এক রাজকুমার পালঙ্কে শুয়ে আছে। আর তার মাথার একপাশে সন্ন্যাসীর দেওয়া পাতা। তাই দেখে তার মাথায় এক দুষ্টু বুদ্ধি এল। কাজলরেখা ফিরে আসার আগেই রাজকুমারের চোখের সুচ দুটি তুলে, চোখের কোলে মাখিয়ে দিল সেই পাতার রস।



দেখতে না-দেখতেই সর্ব অঙ্গ নড়ে উঠল, মুহূর্তের মধ্যে আলস্য ভেঙে উঠে বসল রাজকুমার। যেন গভীর ঘুম সবে ভাঙল। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল চারপাশ। আস্তে আস্তে সম্বিত ফিরে পেল। কঙ্কণদাসীকে বলল, 'তোমার জন্য আমি আবার প্রাণ ফিরে পেলাম। কী চাও তুমি আমার কাছে?'

এই শুনে কঙ্কণদাসী যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেল। বলল, 'আমি রাজরানী হতে চাই।' সে কথা শুনে—



তিন সত্য করে কুমার ধর্ম সাক্ষী মানি।
আজি হতে হইলা তুমি আমার ঘরের রানী।।

এমন সময় স্নান সেরে কাজলরেখা মন্দিরে এসে দ্যাখে রাজকুমার কঙ্কণদাসীর পাশে বসে গল্প করছে। কাজলরেখাকে দেখে কঙ্কণদাসী বলল, 'স্নানের ঘাটে একে আমি কঙ্কণ দিয়ে কিনেছি, এ আমার দাসী।'

এসব মিথ্যে কথা —বলতে গিয়েও বলতে পারল না কাজলরেখা। সন্ন্যাসীর নিষেধাজ্ঞা মনে পড়ল, নিজের পরিচয় দেবার আর সাহস পেল না সে। কঙ্কণদাসীকে মিথ্যে প্রমাণ করতে গেলেই তাকে নিজের পরিচয় দিতে হবে, তাই কঙ্কণদাসীর কথা ঘাড় পেতে মেনে নিল।

রানী হইল দাসী আর দাসী হইল রানী।
কপাল দোষে কাজলরেখা জন্ম অভাগিনী।।

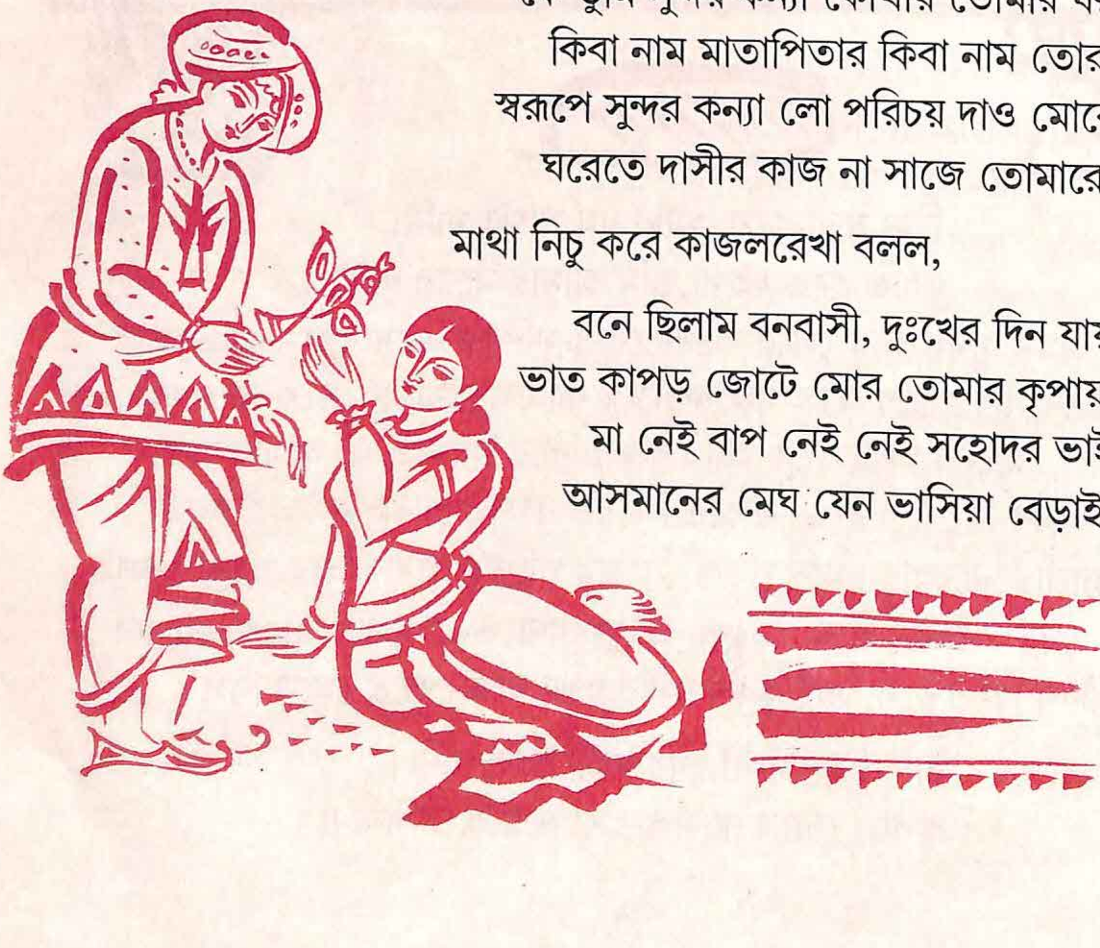
কাজলরেখা এখন রাজবাড়িতে দাসী হয়ে থাকে। তার কাজ জল আনা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজা আর দিবারাত্রি নকল রানীর সেবা করা। এত করেও সে কঙ্কণদাসীর মন পায় না, তার শুধু ভাবনা এই বুঝি কাজলরেখা রাজকুমারের কাছে তার আসল পরিচয় বলে দেয়, এই ভয়ে তাকে সে চোখের আড়াল করে না।

এদিকে সুচরাজকুমার কাজলরেখার কথাবার্তা, আদব-কায়দা সব কিছু লক্ষ্য করে। আর দ্যাখে তার চাঁদের ছটার মত রূপ। যত দ্যাখে ততই মুগ্ধ হয় রাজকুমার। একদিন আর থাকতে না পেরে কাজলরেখাকে বলল,

কে তুমি সুন্দর কন্যা কোথায় তোমার ঘর।
কিবা নাম মাতাপিতার কিবা নাম তোর।।
স্বরূপে সুন্দর কন্যা লো পরিচয় দাও মোরে।
ঘরেতে দাসীর কাজ না সাজে তোমারে।।

মাথা নিচু করে কাজলরেখা বলল,

বনে ছিলাম বনবাসী, দুঃখের দিন যায়।
ভাত কাপড় জোটে মোর তোমার কৃপায়।।
মা নেই বাপ নেই নেই সহোদর ভাই।
আসমানের মেঘ যেন ভাসিয়া বেড়াই।।





ক'দিন হল রাজকুমারের রাজকার্যে কোনো মন নেই। গালে হাত দিয়ে খালি ভাবে। কী যে এত ভাবে কেউ তার হদিস পায় না। কেউ বলে বুড়ো বাবা-মার কথা ভাবে। কেউ বলে রানীর কথা ভাবে। আবার কেউ বা বলে রাজকুমারের হয়তো কঠিন কোনো ব্যাধি হয়েছে। রাজকুমারের মন খারাপ। রাজকুমার খায় না, ঘুমায় না।

একদিন মন্ত্রীকে ডেকে রাজকুমার বলল, 'অমি ছ'মাসের জন্য দেশ ভ্রমণে যাবো,তুমি রাজকার্যের ভার নাও।'

রাজকুমারের নৌকো সাজানো হল। দিনক্ষণ ঠিক হল। যাবার সময় অন্দরমহলে এসে রানীকে বলল, 'বিদেশ থেকে তোমার জন্য কী আনব বলো?'

রানী খুশিতে ডগমগ। বলল, 'আমার চাই বেতের কুলো, বেতের ঝুড়ি আর আমলকী কাঠের ঢেঁকি।'

শুনে রাজকুমার অবাক হল। সে ভেবেছিল রানী হয়তো আবদার

করে চাইবে গজমতি হার, মুক্তোর মালা, কিম্বা নীলাম্বরী শাড়ি। সে সব না চেয়ে, চাইল কি না ধামা, কুলো আর ঢেঁকি ! কঙ্কণদাসীর লোভ শুধু সোনাদানা মণিমুক্তোর,কিন্তু দীর্ঘদিনের স্বভাব কি আর এত তাড়াতাড়ি পালটায়।

এরপর রাজকুমার কাজলরেখার কাছে গিয়ে বলল, 'আমি বিদেশে যাচ্ছি, সেখান থেকে তোমার জন্য কী আনব বল?' কাজলরেখা বলল, 'আমি কিছুই চাই না। এখানে আমি সুখে আছি। আমার কোনো অভাব নেই।' শেষে অনেক সাধার পর কাজলরেখা বলল, 'পারলে আমার জন্য একটা ধর্মমতি শুকপাখি আনবেন।'

বিদেশে এসে রানী যা বলেছিল সব কিনল রাজকুমার। কিন্তু ধর্মমতি শুকপাখির সন্ধান কোথাও পেল না। অনেক খোঁজার পর শেষে ভাটি মুলুকে ধনেশ্বর সওদাগরের কাছে পেল ধর্মমতি শুকপাখির সন্ধান।

এদিকে ধনেশ্বর সেই যে কাজলরেখাকে মৃত রাজকুমারের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে এসেছে, তারপর থেকে কারুর সঙ্গে আর তেমন কথা বলে না। মেয়ের জন্য কেঁদে কেঁদে দু'চোখ তার অন্ধ হয়ে গেছে। একলা ঘরে মনের দুঃখে বসে থাকে। সংসারের খবর রাখে না কোনো। ছেলে রত্নেশ্বর এখন সবকিছু দেখাশোনা করে। শুকপাখির মাহাত্ম্য সে কিছুই জানে না।

এই বুড়ো হাড়গিলের মত দেখতে পাখিটাকে যখন অনেক টাকা দিয়ে কিনতে চাইছে সুচরাজকুমার, তখন দিয়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ, এই ভেবে সে, ধর্মমতি শুকপাখিকে সুচরাজার কাছে বিক্রি করে দিল।

দেশে ফিরল রাজকুমার। রানী তার শখের জিনিস পেয়ে নিজের ঘরে বিছিয়ে নিয়ে বসল আর কাজলরেখা শুকপাখিকে পেয়ে আনন্দ আর কৃতজ্ঞতায় কেঁদে ফেলল।



কঙ্কণদাসীর কুটিল মন। কূটকচালি ছাড়া আর কিছুই জানে না। সবসময় ভাবে কী করে কাজলরেখাকে আরো জব্দ করা যায়। একদিন সে ডেকে বলল, 'কাল থেকে তোমাকে শুধু ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজা করলেই চলবে না, রান্নাবান্নার কাজও করতে হবে।'

কাজলরেখা কোনো আপত্তি করল না, ঘাড় নেড়ে শুধু বলল, 'ঠিক আছে তাই করব।'

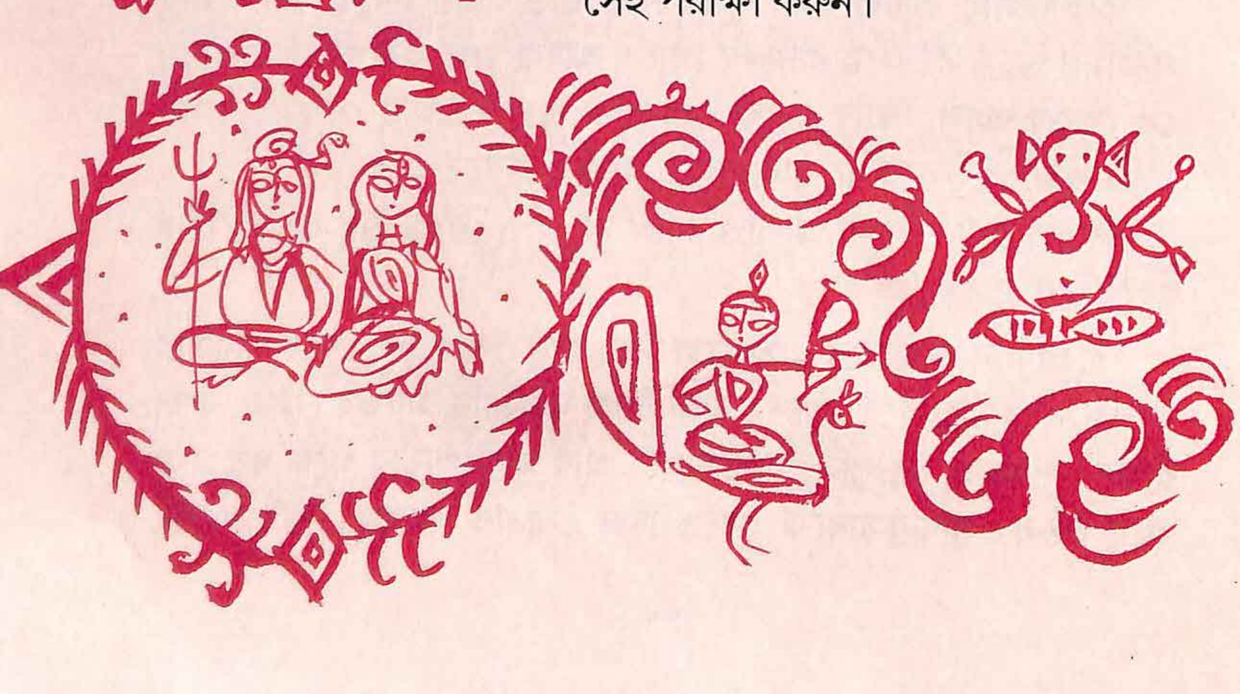
পরের দিন কাজলরেখা সকালে উঠে স্নান সেরে, চুল বেঁধে পরিষ্কার কাপড় পরে রান্নাঘরে গেল। নানা রকম তরকারি, মাছের ঝোল, ঝাল রাঁধল। পরমান্ন, চন্দ্রপুলি, পাটিসাপটা আর মালপোয়ার গন্ধে ঘর ম-ম করে উঠল। রাজকুমারকে খেতে দিল সোনার থালায়। শালিধানের



ভাত। সোনার বাটিতে দুধ ক্ষীর।

উত্তম কাঁঠালের পিড়ি ঘরেতে পাতিল।
ছিটা ছড়া দিয়া কন্যা পরিচ্ছন্ন করিল॥
সোনার থালে বাড়ে চিক্কন সাইলার ভাত।
ঘরে ছিল পাতি নেম্বু কাইটা দিল তাত॥
সোনার বাটিতে রাখে দধি দুগ্ধ ক্ষীর।
ঘরে মজা সবরি কলা কইরা দিল চির॥

রাজকুমার কাজলরেখার হাতের রান্না খেয়ে অবাক। সন্দেহ হল তার, এ তো দাসীর মেয়ে হতে পারে না। মন্ত্রীকে বলল, 'কাজলরেখার আসল পরিচয় কী, খুঁজে বার কর।' আশ্বিন মাস এল। কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর দিন মন্ত্রী বলল, 'দেখুন রাজকুমার, শিল্পকলাতে মানুষকে অনেকটা চেনা যায়। কাজলরেখাকে সেই পরীক্ষা করুন।'



রাজকুমার মন্ত্রীর পরামর্শ মেনে নিল। প্রথমে রানীকে আলপনা দিতে বলল, রানী খুব অবহেলার সঙ্গে কাকের ঠ্যাং বকের ঠ্যাং করে কাজ সারল। দেখে হতাশ হল রাজকুমার।

এবার কাজলরেখার পালা। কাজলরেখা শালিধানের পিটুলি দিয়ে খুব যত্ন করে লক্ষ্মীর পা, ধানের গোলা, ধানের ছড়া, মা বিষহরি দেবী, বনদেবী, কৈলাসে শিবদুর্গার যুগল মূর্তি, কার্তিক, গণেশ, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, চন্দ্র, সূর্য কত যে ছবি আঁকল তার শেষ নেই।

সেই আলপনা দেখে সবাই অবাক। তার বাহবা আর প্রশংসা শুনে নকল রানী কঙ্কণদাসী হিংসেতে জ্বলেপুড়ে মরতে লাগল। মনে মনে ভাবল, পথের কাঁটা কাজলরেখাকে যে করেই হোক দূর করতে হবে।

রাত পোহাতেই নকলরানী চিৎকার করে বাড়ি মাথায় তুলল। 'কাজলরেখাকে বনবাসে না পাঠালে আমি আজ থেকে অন্নগ্রহণ করব না।' এই বলে গোঁসাঘরে ঢুকে দরজায় খিল দিল।

রানী উপবাসী থাকলে রাজ্যের অমঙ্গল। শেষে রাজকুমার আর কী করে, বাধ্য হয়ে ঠিক করল, কাল সকালেই কাজলরেখাকে নির্বাসন দেবে।





কাজলরেখা সেই শুনে কাঁদতে কাঁদতে নিজের ঘরে গিয়ে শুকপাখিকে বলল, 'ওহে ধর্মমতি,আর কত কষ্ট আছে আমার কপালে।' শুকপাখি আধবোজা চোখে বলল, 'রাত যখন শেষ হয়ে আসবে, উষার আলো যখন আকাশ রাঙাবে, তখন আমার কাছে এসো। এখন কিছু মাথায় আসছে না।'

কাজলরেখার রাত আর কাটে না। চুপ করে শুধু প্রহর গোনে। উষার আগেই ধর্মমতি শুকপাখির কাছে এল।

নিশিরাতে পুনঃ কন্যা ডাক দিয়া কয়।
জাগ জাগ শুকপাখি রাত যে ভোর হয়॥
সত্য যুগের পাখি তুমি কহ সত্য বাণী।
কোনদিন পোহাবে মোর দুঃখের রজনী॥

শুকপাখি কাজলরেখার কান্না দেখে আর চুপ করে থাকতে পারল না। বলল, 'তুমি আর কেঁদো না। সব দুঃখেরই শেষ হয় একদিন। সেই দিনটার জন্য আরো ধৈর্য ধর কাজলরেখা।'

এদিকে কাজলরেখার ভাই রত্নেশ্বর বাণিজ্যে বেরিয়েছে। কত নগর,



কত দেশ ঘুরে অজানা এক দ্বীপে তার নৌকো এসে থামল।

রত্নেশ্বর চড়ায় নেমে কিছুটা এগিয়ে গেয়ে দেখে বিশাল নলখাগড়ার বনে এক মলিনবসনা পরমা সুন্দরী কন্যা। যেন সাক্ষাৎ বনদেবী। সেই কন্যা যে তার ছোটবেলার হারানো দিদি, তা বুঝতে পারল না রত্নেশ্বর।

কাজলরেখাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরল রত্নেশ্বর। নিজের বাড়িতে ফিরে বাবাকে অন্ধ দেখে কাজলরেখা শোকে উথলে উঠল। কিন্তু সন্ন্যাসীর নিষেধের কথা মনে পড়তে, সব দুঃখ মুছে ফেলল মন থেকে। গোপন করে রাখল তার নিজের পরিচয়।

কিন্তু রত্নেশ্বরের মনে সন্দেহের দানা বাঁধে। বারবার শুধু বলে 'কী নাম তোমার? কী পরিচয় তোমার সত্যি করে বল।' একদিন কাজলরেখা আর থাকতে না পেরে বলল, 'সন্ন্যাসীর নিষেধ আমি ভাঙতে পারব না। পরিচয় যদি জানতে চাও তাহলে সুচরাজকুমারের ঘরে যে ধর্মমতি শুকপাখি আছে, তাকে জিজ্ঞাসা করো, আমার সব পরিচয় পাবে।'

এই কথা শুনে রত্নেশ্বর ধর্মমতি শুকপাখিকে আনার জন্য লোক পাঠাল। রত্নেশ্বরের লোক সুচরাজার দেশে এসে শোনে রাজা দেশান্তরী

হয়েছে। সেই সুযোগে নকল রানী মণিমুক্তোর লোভে রত্নেশ্বরের লোকের কাছে বিক্রি করল ধর্মমতি শুকপাখি।

এদিকে সুচরাজকুমার উদাসী হয়ে ঘুরে বেড়ায়। কাজলরেখাকে নির্বাসন দিয়ে অবধি মন তার সবসময় কাঁদে।কোনো দেশেই আর মন বসে না। এক দেশ থেকে আর এক দেশ, এক রাজ্য থেকে আর এক রাজ্য ঘুরে বেড়ায়। এই ভাবে ঘুরতে ঘুরতে একদিন সে ভাটি মুলুকে এসে পৌঁছল।

সেখানে এসে দ্যাখে কোথায় যেন দলে দলে লোক চলেছে। সুচরাজকুমার এক পেয়াদাকে ডেকে বলল, 'এরা সব দল বেঁধে কোথায় যাচ্ছে ?' পেয়াদা বলল, 'ধনেশ্বর বণিকের ছেলে রত্নেশ্বর বাণিজ্য করতে গিয়ে বালির চড়ায় এক অপরূপ কন্যাকে কুড়িয়ে পেয়েছে। আজ ধর্মমতি শুকপাখি ধনেশ্বরের প্রাসাদে সভার মাঝে তার পরিচয় দেবে।'



এই কথা শোনামাত্র সুচরাজকুমার আর থাকতে পারল না। তখুনি চলল ধনেশ্বরের প্রাসাদে।

সভায় লোক গমগম করছে। কখন বলবে শুকপাখি, সকলেই সেই অপেক্ষায় বসে। এমন সময় সোনার দাঁড়ে শুকপাখিকে সভার মাঝে আনা হল।

সব চুপচাপ। শুকপাখির আজ আর কোনো ঘুমঘুম ভাব নেই, চারদিক দেখে নিয়ে শুরু করল তার কথা।

ধর্মমতি শুক আমি করি নিবেদন।
মন দিয়া পূর্বকথা শুন সভাজন॥

প্রথমে বলল, ধনেশ্বরের দারিদ্র্যের কথা। তারপর কাজলরেখার বনবাস। সুচরাজকুমারের সঙ্গে কাজলরেখার বিয়ে। কঙ্কণদাসীর ষড়যন্ত্র। কাজলরেখা হল দাসী আর কঙ্কণদাসী কী ভাবে হল রানী সেই কথা পরপর সব বলে গেল শুকপাখি।

এরপর দাঁড় থেকে উড়ে দালানের কার্নিশে গিয়ে বসল পাখি। শুরু করল সুচরাজকুমারের কথা।

'চম্পকনগরে এক রাজা ছিল। নাম হীরাধর। রাজার কোনো ছেলেপুলে নেই। দেবদেবীর পুজো করে, মানত করে কিছুতেই কিছু হয় না। এমন সময় এক সন্ন্যাসী তাকে দিলেন এক অমৃতফল। রানীর ছেলে হল। হীরাধরের আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু যৌবনে পা দিতেই ছেলের মৃত্যু হল। রাজা ছুটে গেল সন্ন্যাসীর কাছে। তিনি বললেন, "দুঃখ কোরো না। এই ছেলের সারা গায়ে সুচ ফুটিয়ে দিচ্ছি, দক্ষিণের বনে এক মন্দির আছে সেখানে রেখে এসো একে।" তাই করল হীরাধর। তারপর কাজলরেখার সেবায় প্রাণ ফিরে পেল সুচরাজকুমার। কিন্তু কাজলরেখার কী হল!'

এই পর্যন্ত বলে শুকপাখি উড়ে গিয়ে প্রাসাদের চূড়ায় বসল।

আজি হতে কাজলরেখার দুঃখের দিন যায়।
এই কথা কহি পাখি শূন্যতে মিলায়॥



সভার সব লোক অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল শূন্য আকাশের দিকে। দশ দিক, দশ দিগন্ত কোথাও পাখির চিহ্নমাত্র নেই। নীল আকাশে শুধু ফুরফুরে শরতের মেঘ। সুচরাজকুমার আর থাকতে না পেরে নিজের পরিচয় দিল সভার মাঝে।

সভা তখন সুখের বন্যায় ভরে উঠল। মেয়েকে ফিরে পেয়ে সওদাগরের অন্ধত্ব গেল ঘুচে। বোনকে পেয়ে রত্নেশ্বরের আর আনন্দের সীমা নেই।

অন্দরমহলে শাঁখ বেজে উঠল। রোশনচৌকিতে সানাই শুরু হল। হৈ-চৈ আর আতসবাজিতে ছেলেরা মেতে উঠল আনন্দে।

ক'দিন বাদেই সুচরাজকুমার কাজলরেখাকে নিয়ে দেশে ফিরল। নকল রানী কঙ্কণদাসী এত কাণ্ডের কিছুই জানে না। রাজকুমার তার ঘরে এসে মিথ্যে করে বলল, 'রানী, ভয়ঙ্কর কথা, ভাটির দেশের রাজা আমাদের বাড়ি আক্রমণ করতে আসছে, এখুনি কোথাও লুকোতে হবে।'

এই কথা শুনে কঙ্কণদাসী তাড়াতাড়ি নিজের গয়নাগাঁটি, সোনাদানা, মণিমাণিক্য যা ছিল সব পুঁটুলির মধ্যে পুরে সকলের আগে চোরা কুঠরিতে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল। আর অমনি সুচরাজকুমার কুঠরির দরজা চিরদিনের মত মাটি ফেলে বন্ধ করে দিল।

সুচরাজকুমার আর কাজলরেখা তারপর সুখে শান্তিতে ঘর করতে লাগল।

এক ছিল কন্যা। কাজলরেখা। আর ছিল ধর্ম্মমতি নামে এক শুকপাখি। সেই ধর্ম্মমতির কথায় একদিন ভোর রাতে ধনেশ্বর সওদাগর মেয়ে কাজলরেখাকে নিয়ে নৌকোতে উঠল। তিন দিন তিন রাত্রি চলার পর সেই নৌকো এসে থামল এক নির্জন বনের ধারে। সেই বনে কোনও জনমনিষ্যি নেই। আছে শুধু একটা ভাঙা মন্দির। মেয়েকে মন্দিরের চাতালে বসিয়ে রেখে তার জন্য জল আনতে গেল সওদাগর। সুয্যিদেব পাটে বসলেন। নেমে এল ঘুটঘুটে রাত্তির।

পূর্ববঙ্গের প্রাচীন পালাগানগুলির মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে মণিমুক্তোর মত আশ্চর্য এরকম অনেক রূপকথা। প্রবীর সেনের লেখা ও কৃষ্ণেন্দু চাকীর ছবিতে নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে প্রাচীন গীতিকা থেকে নেওয়া এই রূপকথার গল্প। যে গল্প কোনদিনও পুরোনো হবে না, যা বাংলার একান্ত আপন সম্পদ।

ওরিয়েন্ট লংম্যান

KAJALREKHA : Traditional Bangla Fairy Tale

ISBN O 86311 140 8

Price Rs 12.50